বৌদ্ধ সাধনা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সত্য উপলব্ধি করে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করলেন ও চোয়াল্লিশ বৎসর ধরে তিনি যে সত্য প্রচার করেছিলেন সেই আর্যসত্যের মূল কথা হচ্ছে এই যে দুঃখ হচ্ছে সব উৎপত্তি-গত জীবনের ধর্ম, এই দুঃখের মূল হচ্ছে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা—তন্‌হায় জায়তী সোকো, তন্‌হায় জায়তী ভয়ং, তন্‌হায় বিপ্পমুত্তস্স, নত্থি সোকো কুতো ভয়ং?—ধম্মপদ; দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব ও এই দুঃখ দূর করবার আটটি উপায় বা পথ আছে।

বৌদ্ধধর্মের মতে এই দুঃখ হচ্ছে মানুষের নিজের কর্মের ফলস্বরূপ। এই দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে ও করবে শুধু নিজের প্রচেষ্টায়—আত্মোপলব্ধির দ্বারা। ভগবানের মধ্যস্থতায় দুঃখ দূর হবে না। ভগবানের মধ্যস্থতা বৌদ্ধধর্ম মানে না। ভগবৎকৃপার স্থান তাই মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টাতেই নিজেকে ও সামাজিক আবেষ্টনীকে বদল করতে পারে ও নেই বৌদ্ধসাধনায়। মানুষ তার সামাজিক আবেষ্টনী তৈরী করেছে, নিজেকে তৈরী করেছে। অতিক্রম করতে পারে। এটা ক্রমাভিব্যক্তির পথ ধরেই ঘটবে। যাঁরা বুদ্ধ তাঁরা যুগে যুগে এই পথই দেখিয়ে গেছেন।

বৌদ্ধধর্ম-মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে নয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে উচ্চ আদর্শের দিকে, আর্য-সত্যের দিকে পরিচালিত করেই মানুষ মুক্তি পাবে। ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্রে দেখি বুদ্ধদেব গুরু পারাশার্থ-এর শিষ্যকে প্রশ্ন করে যখন জানলেন যে তাঁর গুরু তাঁকে এমন করে ইন্দ্রিয়নিরোধ করতে বলেছেন যাতে ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব কার্য—দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি—থেকে বিরত হয়, তখন বুদ্ধদেব এই শিক্ষাকে অর্থহীন শিক্ষা বল্লেন। তিনি বল্লেন এই শিক্ষা যদি মানুষকে মুক্তি দিতো তাহোলে অন্ধ, বধির প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দোষাক্রান্ত লোকেরাই তো শ্রেষ্ঠ সাধক। বুদ্ধদেবের মতে ইন্দ্রিয়গুলিকে তুচ্ছ পার্থিব বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে প্রথমে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বা 'সংজ্ঞা' লাভের চেষ্টা করতে হবে। এই সংজ্ঞার সাহায্যে 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপরে এই বিচারবুদ্ধিজাত জ্ঞানের সহায়তায়, 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ অনুভূতিজাত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবশেষে এই প্রজ্ঞার সাহায্যে 'বোধি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ-উপলব্ধিজাত জ্ঞান লাভ হবে। এই হচ্ছে প্রকৃত দর্শন, সর্বোত্তম জ্ঞান। বৌদ্ধধর্ম আষ্টেপৃষ্ঠে-বাঁধা শাস্ত্র-মতের জ্ঞানের চেয়ে এই বোধিকে অনেক উচ্চে স্থান দেয়। এই জ্ঞানের ফলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পায় ও পরিপূর্ণ চৈতন্য লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম-মতে সত্য-উপলব্ধি সত্যের উপর বিশ্বাস বা ভক্তি থেকে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় মানুষের জন্যে। এই সত্য উপলব্ধি করতে গেলে আটটি বস্তুর প্রয়োজন—(১) উচিত জ্ঞান (২) উচিত উদ্দেশ্য (৩) উচিত বাক্য (৪) উচিত কর্ম (৫) উচিত জীবিকা-অর্জনের উপায় (৬) উচিত চেষ্টা (৭) উচিত সজাগতা ও (৮) উচিত একাগ্রতা।

উচিত জ্ঞান

এই উচিত জ্ঞান কাকে বলে? সব ভৌতিক দ্রব্য, ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান, এসব অনিত্য এই চেতনাই হচ্ছে উচিত জ্ঞান। ঘটনা, দ্রব্য ও ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি বস্তুত যা অর্থাৎ

অনিত্য, এই চেতনা-লাভ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যে সাধককে হিংসালেশ-শূন্য জীবন যাপন করতে হবে ও ধ্যান (ভাবনা) করতে হবে; তবে অজ্ঞানতার হাত থেকে ও অবিদ্যার শৃঙ্খল থেকে তার মুক্তি হবে। এই জ্ঞান-লাভের পথে সাধক যতো এগোবে ততই তার মন থেকে লৌকিয় ভাব অর্থাৎ এই লোক-সংক্রান্ত ভাবগুলি—ঝরা পাতার মতো খসে পড়বে। সাধকের চেতনা এক উচ্চতর চিৎভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

উচিত উদ্দেশ্য

যে জ্ঞান বা সত্য উপলব্ধি করা হয়েছে সেই জ্ঞান বা সত্যকে জীবনের সর্ব কার্যে প্রতি-ফলিত করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা উচিত উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান জীবনের প্রতিটি কাজে আপনাকে স্বপ্রকাশ না করে সে জ্ঞান নিষ্ফল থেকে যায়। যে মানুষ জ্ঞান লাভ করে তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে, তার বাক্যে, আচরণে ও কর্মে সেই জ্ঞানের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, সে মানুষ জীবনে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে নি; তার জ্ঞান বন্ধ্যা।

দুই জাতের কিম্বা দুই স্তরের উদ্দেশ্য আছে, একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, আর একটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই সংসারের সীমার মধ্যে জ্ঞানের বা সত্যের প্রকাশ হচ্ছে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বোধি লাভ করে সব আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া বা নির্বাণলাভ করা।

উচিত বাক্য

সত্য ও করুণা-সিক্ত বাক্যই উচিত বাক্য। যে বাক্য জ্ঞানের উৎস থেকে নিঃসারিত হয়নি, শুধু অজ্ঞানতা ও সংস্কারের অন্ধ অভ্যেস থেকে জন্ম লাভ করেছে, সেই বাক্য নিরর্থক। যে বাক্য মানুষের প্রতি প্রেমের রসে সরস নয়, উজ্জ্বল নয়, সে বাক্য মৃত বাক্য। জ্ঞান ছাড়া করুণা সম্ভব নয়। জন্মমৃত্যুর চক্রে জীব বাঁধা রয়েছে এই জ্ঞান থেকেই করুণার উদ্ভব।

উচিত কর্ম

শান্তিময়, সৎ ও পরহিতকারী কর্মই উচিত কর্ম। যে কর্ম সংঘাত সৃষ্টি করে কিম্বা সংঘাতের সম্ভাবনা ঘটায়, সে কর্ম অনুচিত কর্ম, অমঙ্গলের হেতু। সৎ কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা জ্ঞান-প্রসূত, যা নিছক জড়-অভ্যাসজাত নয়। জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসা আছে, বিচার আছে। সৎ কর্ম বিচারমূলক লৌকিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ। যে কর্ম মানুষের কল্যাণ করে না সে কর্ম একেবারে নিষ্ফল। পরহিতকারী কর্মের প্রেরণা দেয় জ্ঞান ও করুণা। জ্ঞান ও করুণা মানুষকে আত্মাভিমানের খণ্ডতা-দোষ দূর করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের অনুভূতি দেয়। সেই অনুভূতি মানবহিতকারী কর্মের প্রেরণা যোগায়।

জীবিকা অর্জনের উচিত উপায়

যে উপায়ে জীবিকা অর্জন করলে কারো ক্ষতি করা হয় না কিম্বা জীবিকা অর্জন কারো দুঃখের কারণ হয় না, জীবিকা-অর্জনের সেই উপায়ই হচ্ছে উচিত উপায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সোজাসুজি ভাবে জীবিকা-অর্জনের ব্যাপারটিকে ধর্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করে নি। এটি বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য। জীবিকা অর্জন যেন কোনো উপায়ে করা যেতে পারে, তার সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো যোগ নেই—এই হোলো শিক্ষিত(!) সমাজের ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা! এই সর্বনেশে প্রবঞ্চনাকে আঘাত হেনেছে বৌদ্ধ মতবাদ। মানুষের জীবনের কোনো অংশকেই ধর্ম-সাধনা থেকে বাদ দেবার উপায় নেই। তার আহার-বিহার-

চিন্তা-অনুভূতি সব এক সূত্রে বাঁধা। একটি জায়গায় কলুষ স্পর্শ করলে সব কলুষিত হবে। সকালে চোরাকারবার করে সন্ধ্যে বেলা ধার্মিক **সাজা** যেতে পারে, সাজছেও লোকে এই সমাজে, কিন্তু ধার্মিক **হওয়ার** কোনো উপায় নেই।

উচিত চেষ্টা

চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবার, সংযত করবার চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। কামনার হাওয়ায় চিন্তা সতত আন্দোলিত, জ্ঞানের অনড়ভূমিতে চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। কামনার আলেয়ার পেছনে কর্মনিয়ত প্রধাবিত, মানব-কল্যাণের চেতনার আলোকে কর্ম উদ্ভাসিত হতে পারছে না। কামনার এই অসংযত ও ব্যর্থ ছোটাছুটি ও হয়রাণির হাত থেকে চিন্তা ও কর্মকে বাঁচানোর চেষ্টাই হচ্ছে উচিত চেষ্টা। যা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকবার প্রয়াস, যা সকলের হিতকারী তা সাধন করবার প্রচেষ্টা, কামনা ও অজ্ঞানতা অতিক্রম করবার নিরন্তর সংগ্রাম, নির্বাণের পথে অগ্রসর হবার জন্যে অবিরাম সাধনা—এই হচ্ছে উচিত চেষ্টা।

উচিত সজাগতা

ব্যক্তিগত জীবনের ও সমষ্টিগত সামাজিক জীবনের বিভিন্ন চিন্তাধারার ও কর্মের কারণ ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে সজাগতাই হচ্ছে উচিত সজাগতা।

জীবনের পথ দিয়ে মানুষ চলে যায়, চলে যায় যেন তন্দ্রার ঘোরে। তন্দ্রার ঘোরে চলতে চলতেই তার জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর জাগরণহীন নিদ্রায়। অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার এরা দুটি হোলো ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, আমাদের চেতনাকে এরা সব সময়েই জড়তার ও অজ্ঞানতার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করে। তার ফলে অন্তরের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় না, মানব-প্রেম জাগে না, কর্ম জ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ না করে মানুষের কল্যাণ-সাধনের শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সজাগতার এতো প্রয়োজন। শরীর ও মন সম্বন্ধে সজাগতা, অতীতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিচারশীল সজাগতা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানসিক সজাগতা। এই সজাগতা থাকলেই মানুষ জ্ঞান লাভ এবং চিন্তায় ও কর্মে মহীয়ান হয়।

উচিত একাগ্রতা

সব চিন্তা বাদ দিয়ে বিশেষ একটি চিন্তার উপর মনকে কেন্দ্রস্থ করা ও প্রতিষ্ঠিত করাই হোলো উচিত একাগ্রতা। মন যেন হরিণ সে কেবলই ছুটে বেড়ায় অন্তর ও বাহিরের বনবনান্তরে। কোথাও তার স্থিতি নেই, তাই অস্থির মন কোনো বস্তুর সত্তার স্পর্শ পায় না। কেবল জীবনের উপরে উপরেই মনের যাওয়া-আসা, তাই কোনো বস্তুর সত্তার আস্বাদন করা তার ভাগ্যে ঘটে না। অথচ মন সত্তার আস্বাদ পেতে পারে ও মনের প্রকৃত কার্যই হোলো বস্তুর সত্তার প্রকৃত আস্বাদন। মন যখন এই উচিত একাগ্রতার সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সমাধি প্রাপ্ত হয় তখন পন্না অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় ও মনের অন্তর্দৃষ্টির বন্ধ দরজা খুলে যায়। এই একাগ্রতা (অথবা সমাধি) দুই রকমের —প্রাথমিক একাগ্রতা (উপকার সমাধি) ও পূর্ণ একাগ্রতা (অপপনা সমাধি)। উচিত একাগ্রতা লাভের পরে আত্মপ্রত্যয়মূলক চিন্তা (intuitive thinking) সুরু হয়। মহাযানীদের মধ্যে যাঁরা 'জেন' সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁরা 'সতরি' অর্থাৎ এক ঝলক সত্য-লাভে বিশ্বাস করেন। আত্মশুদ্ধি অবশ্যি অনেক কাল ধরে চলেছে তার আগে।

এই প্রাথমিক একাগ্রতা সাধনার জন্যে কতকগুলি বস্তুর সাহায্য নেবার নির্দেশ আছে। এই

বস্তুগুলিকে 'কসিন' বলা হয়। কসিন দশ প্রকার—মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, জল, লাল রঙ, নীল রং, শাদা রং, হল্‌দে রং, আলো ও বিস্তৃতি।

ছুটন্ত মনকে সব কিছুর থেকে গুটিয়ে এনে একটি বিশেষ কিছুর মধ্যে সমাহিত করবার জন্যে এই কসিনগুলির সৃষ্টি। কসিনগুলি যে কোনো একটিকে নিয়ে মন যদি আপনাকে স্থিরতা ও সংযম শিক্ষা দেয় তাহোলে কাজ এগলো। এটা কিন্তু নিছক প্রাথমিক একাগ্রতার জন্যে প্রয়োজন। তারপরে কসিনগুলির আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মন আপনার সুপ্ত শক্তিকে উদ্ধার করে নিয়েছে জড়তার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চৈতন্য-উদ্ভাসিত মনের আর বাইরের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন থাকে না।

ধ্যানকে বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভাবনা' বলা হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন যে "ধ্যান ছাড়া জ্ঞান নেই, জ্ঞান ছাড়াও ধ্যান নেই। যার ধ্যান আছে ও জ্ঞান আছে, সে-ই এই ভৌতিক জগতে বস্তুর (reality) কাছাকাছি পৌঁচেছে।"

'ভাবনা'-র (ধ্যানের) জন্যে মনকে কঠোর শিক্ষা দেওয়া দরকার। মন চারিদিকে দৌড়তে চায় আগুনের শিখার মতো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় পারার মতো। তাকে স্থির করতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। ধ্যান ছাড়া মন আত্ম-সমাহিত হয় না আর যে মন সমাহিত নয় জ্ঞান তার কাছে ধরা দেয় না। তাই ভারতীয় সাধনায় ভাবনা (ধ্যান) এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ভাবনা দু'রকমের—(এক) সমাধি ভাবনা (দুই) ভিপ্পস্গনা ভাবনা।

সমাধি ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক মনের একমুখিনত্ব লাভ করেন। মন তখন নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে নানা বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয় না। মন তখন একাভিমুখিন হয়ে স্থিরতা ও অচঞ্চলতা লাভ করে। তখন চারিদিকের ভৌতিক দ্রব্য তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না। ভৌতিক-দ্রব্য-সংস্পর্শ-জাত উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে মন প্রশান্তি লাভ করে। সমাধি ভাবনায় মনকে একবার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে মনকে স্থির করবার জন্যে বহির্জগতের কোনো দ্রব্যের অর্থাৎ কসিনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না। ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান তখন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখিনতা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যানের পথে মন শুচিতা লাভ করে ও ইন্দ্রিয়-পরবশতা সম্পূর্ণ-ভাবে অতিক্রম করে। তখন মন চারটি বিশেষ ecstatic অবস্থা প্রাপ্ত হয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই অবস্থাগুলিকে 'ঝানস্' বলা হয়। সমাধি ভাবনার চারটি ঝানস্-এর সর্বোত্তম ঝানস্ লাভ করলে শরীর ও মনের শান্তি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করা যায়। এই অবস্থায় পৌঁছলে সাধক পাঁচটি বুদ্ধিজাত-উপলব্ধি লাভ করেন। এই বুদ্ধিজাত-উপলব্ধিকে 'অভিন্না' বলা হয়। এই পাঁচটি অভিন্না হচ্ছে—(এক) অপ্রাকৃতিক আশ্চর্য ক্ষমতালাভ (দুই) দিব্য দৃষ্টি (তিন) দিব্য শ্রবণ (চার) পূর্বজন্ম-স্মরণ (পাঁচ) অন্যের চিন্তা ও মানসিক ক্রিয়া বোঝবার ক্ষমতা।

এগুলি কিন্তু 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) লক্ষ্য নয়। এই 'অভিন্না'-লাভ সাধনার নিম্নস্তরের বস্তু। যিনি এই সব ক্ষমতা-লাভের মোহে আবদ্ধ হলেন তাঁর ধ্যান ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেন না ক্ষমতা-লাভের জন্যে ধ্যান নয়, ধ্যান হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্যে। তাই যে সাধক এই 'অভিন্না'-প্রাপ্তির পরেও এগোতে চান তাঁকে 'কস্সিন'-এর সাহায্যে রূপ-ভাবনা থেকে অরূপ-ভাবনায় (অরূপ-ধ্যান) যেতে হবে। এই উপায়ে সাধক অরূপলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু যেমন 'অভিন্না'-প্রাপ্তি সাধকের চরম লক্ষ্য নয়, তেমনি অরূপলোক-প্রাপ্তিও সাধকের চরম উদ্দেশ্য নয়। 'সমাধি-ভাবনা'-র চতুর্থ 'ঝানস্'-এ পৌঁছে সাধক 'ভিপ্পস্গা ভাবনা'-র দিকে তাঁর মনকে চালিত করবেন।

(দুই) ভিপস্সনা ভাবনা

ভিপস্সনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক বস্তুর আত্মপ্রত্যয়জাত (intuitive) জ্ঞান লাভ করেন। ভিপস্সনা-ভাবনা-সিদ্ধ সাধক কার্য-কারণের শৃঙ্খলে-বাঁধা আমাদের এই হেতু-ভূত অস্তিত্বের তিনটি লক্ষণ উপলব্ধি করবেন—(এক) অনিত্যতা (দুই) দুঃখময়তা ও (তৃতীয়) সব ভৌতিক পদার্থের বস্তুহীনতা।

এই যে সমাধি-ভাবনা ও ভিপস্সনা-ভাবনা, রূপ-ভাবনা ও অরূপ-ভাবনা, এই 'ভাবনা'-র (ধ্যানের) বিষয় হচ্ছে চল্লিশটি—দশটি 'কসিন', দশটি অশুভা, একটি আহারের দোষ (আহারে পতিক্কূলসন্না), একটি ভূত-বিশ্লেষণ (চতুধাতুভভথবনম্), দশটি স্মরণ (অনুস্সতি), চারটি ব্রহ্ম-বিহার ও চারটি অরূপ-ঝানস্।

দশটি 'কসিন'-এর কথা আগেই বলা হেয়েছে। দশটি অশুভ জিনিস, আহারের দোষ অর্থাৎ খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভ এগুলি বর্জন করবার জন্যে মনকে এদের সম্বন্ধে জাগ্রত করতে হবে, হুঁশি-য়ার করতে হবে। তার পরে ভূত-বিশ্লেষণ। প্রতিটি দ্রব্যের ধাতুগত বিশ্লেষণ করতে হবে তাতে তাদের অনিত্যতা-বোধ সম্বন্ধে মন নিঃসংশয় হবে। তার পরে দশটি 'অনুস্সতি' (স্মরণ) ধ্যানের বিষয় হবে। সেই দশটি 'অনুস্সতি' হচ্ছে—বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, শীল, দান, দেব, শান্তি (উপসম) মৃত্যু, দেহের প্রতি মনযোগ (কায়গতা সতি), ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি (অনাপানা সতি)। এর পরে চারটি ব্রহ্মবিহার হবে ধ্যানের বিষয়। এই চারটি বিষয় হচ্ছে—(এক) মেত্তা (দুই) করুণা (তিন) মুদিতা (চার) উপেক্ষা। মেত্তা হচ্ছে প্রেম, তবে অন্ধ প্রেম নয়, নিরাসক্ত প্রেম। অন্ধ প্রেম থেকে কাম ও তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। এই অন্ধ প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,—এই অন্ধ প্রেমের ছায়া হচ্ছে বিদ্বেষ। করুণা সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে এই করুণা জ্ঞান-জাতা। জীব জীব-ন্মৃত্যুর শৃঙ্খলে-বাঁধা, সংসার-চক্রে পিষ্ট—এই জ্ঞান যথার্থ ভাবে লাভ হলে জীবের প্রতি যে জ্ঞান-উদ্ভূত অনুভূতি তারই নাম করুণা। মুদিতা হচ্ছে অচঞ্চল স্থির আনন্দ। এ আনন্দ বোধি লাভের ফল। মন অসংশয় ভাবে 'বস্তু'-র (reailty) জ্ঞান লাভ করে সব ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরি শেষ করেছে। বোধি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মন পূর্ণ চৈতন্যময় হয়ে আনন্দ ভোগ করছে। উপেক্ষা হচ্ছে মনের সেই প্রশান্ত অবস্থা যখন সুখদুঃখ সব সমান বলে মনে হয়। যখন জীব-অস্তিত্বের পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয় তখন অস্তিত্বের ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করে সুখদুঃখ সব সমান বলে প্রতীয়মান হয় মনের কাছে।

চারটি অরূপ-ঝানস্ হচ্ছে—(এক) অসীম বিস্তারের ক্ষেত্র (আকাশানান্সায়তন) (দুই) চেতনার অনন্তবোধক্ষেত্র (ভিন্নানন্সায়তন) (তিন) নির্বস্তুতার ক্ষেত্র (অকিন্নায়তন) ও (চার) অনুভূতি-নয় অ-অনুভূতিও-নয় সেই ক্ষেত্র (নেভসন্নানাসন্নায়তন)। প্রথম ঝানস্-এ ধ্যানের বিষয় বিশ্লেষণ করে চিন্তা করা হয়। বাসনা ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, বিচার ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, নিরাসক্তির আনন্দ অনুভব করে সাধক প্রথম লোকত্তর আনন্দলোক প্রাপ্ত হন।

প্রথম ঝানস্-এ থাকে—(এক) বিশ্লেষণ (ভিতক্ক), (দুই) চিন্তা (ভিকার), (তিন) আনন্দ (পিতি), (চার) সুখ (সুখ), (পাঁচ) চিত্ত-একাগ্রতা (চিত্ত-একাগ্গতা সমাধি)।

দ্বিতীয় ঝানস্-এ থাকে আনন্দ, সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। বিশ্লেষণ ও চিন্তার পৈঠা থেকে মন, উঁচু পৈঠায় পৌঁছয়। এই ঝানস-এর ফলে মনে সুগভীর চিন্তা ও আনন্দ উপলব্ধি স্থায়িত্ব-লাভ করে। তৃতীয় ঝানস্-এ থাকে সুখ ও চিত্ত-একাগ্রতা। আনন্দ বাদ হয়ে যায় এই ঝানস্-এ কেন না আনন্দ অনিত্য। এই অবস্থায় মন অত্যন্ত একাগ্র ও চৈতন্যময় হয়। চতুর্থ ঝানস্-এ শুধু থাকে

নির্বিকার ভাব। সুখে দুঃখে সমভাব। এই সমভাব প্রাপ্ত হলেই সাধক রূপ, বেদনা (sensation) বুদ্ধিগ্রাহ্যতা (সন্ন), সু এবং কু কর্মের জনক মনের অবস্থাগুলি ও ক্রিয়াগুলি(সংখারা) ও চেতনা (ভিন্নান)—এই পাঁচটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে। এই পাঁচটি হচ্ছে ব্যক্তির স্কন্ধ অর্থাৎ অস্তিত্বের গুণ। এই পাঁচটি নিয়েই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

এই ঝানস্ সিদ্ধ হোলে লোকত্তর জ্ঞান (অভিন্না) ও লোকত্তর ক্ষমতা (ইদ্ধি) লাভ হয়। বৌদ্ধ সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্না-ও নয় ইদ্ধি-ও নয়—উদ্দেশ্য নির্বাণ।

ভাবনা-র (ধ্যানের) এই চল্লিশটি বিষয়ের মধ্যে ব্যক্তি বিষয় নির্বাচন করে কি করে? বৌদ্ধ-শাস্ত্র মতে ব্যক্তির চরিত্রের উপর বিষয় নির্বাচন নির্ভর করে। ব্যক্তির চেতনার যে অবস্থা সেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তি ধ্যানের বিষয় বেছে নেয়। চেতনার এই রকম কুড়িটি অবস্থা আছে। অভি-ধম্ম পিটক গ্রন্থে এই বিভিন্ন চেতনার বিশদ আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে চেতনাকে শুধু চেতনা ও অবচেতনা এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে এই বিভাগের সংখ্যা কুড়ি।

যে সব চিন্তা মানুষের অন্তরের রোগস্বরূপ, সেই সব চিন্তার বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে যে সেগুলি অজ্ঞানতার ফল। বৌদ্ধশাস্ত্র মতে মনের এই চিন্তাগুলির আট লক্ষ চুরাশি হাজার মিশ্রণ সম্ভব। এই চিন্তার উৎপত্তি কোথা থেকে এবং এই চিন্তা কতো রূপ দিতে পারে তাই দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, অজ্ঞানতা-প্রসূত এই চিন্তাগুলিকে কি করে রোধ করা যায় তার উপায় বাত্লিয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্র।

আমরা দেখেছি যে ধ্যানের বিষয় নির্বাচন ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ব্যক্তির এই চরিত্র কিসের উপর নির্ভর করে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানের মতে ব্যক্তির চরিত্র নির্ভর করে—(এক) তার দেহের প্রকৃতির উপর (দুই) তার বংশগত চরিত্রের উপর (তিন) তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর—আবেষ্টনীর উপর (চার) তার নিজের কর্ম ও কর্ম-ফলের উপর।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ব্যক্তির চরিত্রের উপাদান ও হেতু বিশ্লেষণ বৌদ্ধশাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দেখে। আধুনিক মনবিজ্ঞান কিম্বা সমাজবিজ্ঞান এর চেয়েও বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় নি মানুষের চরিত্রের হেতু বিশ্লেষণে। প্রতিটি ব্যক্তির দেহের একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে কেন না প্রতিটি দেহই একটি বিশেষ মিশ্রণের ফল। অতএব একজন ব্যক্তির দেহের এই বিশেষ প্রকৃতি তার চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতির জন্যে আংশিক ভাবে দায়ী। ব্যক্তি তো শুধু কার্যকারণ-রহিত ভুঁইফোড় জীব নয়। অস্তিত্ব হচ্ছে ধারা, জীব-অস্তিত্বও ধারা। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান। জীব-অস্তিত্বে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ হচ্ছে বংশগত সম্বন্ধ। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে ব্যক্তি যেমন দেহের উপাদান পায় যা তার দেহের চরিত্র নির্ণয় করে, তেম্নি মানসিক উপাদানও পায় যা তার মনের বিশেষ গঠনের হেতু। আধুনিক কালে বায়লজি ও জেনেটিক্স্ যা বলছে heredity সম্বন্ধে, দুহাজার বছর আগে বৌদ্ধ বিজ্ঞান সে কথা পরিষ্কারভাবে বলে গেছে। তারপরে এলো আবেষ্টনীর (environment) প্রভাব ব্যক্তির চরিত্র গঠনে। দেহের ও মনের বংশগত উপাদানগুলির উপর ব্যক্তির হাত নেই কিন্তু আবেষ্টনীর উপর মানুষের হাত আছে। আবেষ্টনী সামাজিক অবস্থার ফল। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করলে আবেষ্টনী বদল করা যায়। ব্যক্তির চরিত্রের উপর এই আবেষ্টনীর প্রভাব আজকাল সর্বজনস্বীকৃত। তবে কোনো কোনো লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে আবেষ্টনীর যতোটা প্রাধান্য দেয় সে প্রাধান্য উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্বদোষদুষ্ট।

বৌদ্ধ মত বিজ্ঞানসম্মত মত, তাই তাতে সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যনির্ণয় ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। চতুর্থ ও শেষ প্রভাব ব্যক্তির চরিত্রের উপর হোলো তার কৃত কর্মের। যে কর্ম আমরা করি সে যেমন আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির দ্বারা নির্ণীত তেম্‌নি যে কর্ম আমরা করি সেই কর্ম আমাদের দেহের চরিত্র, বংশগত চরিত্র ও আবেষ্টনী—এই তিনটিকে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত করে। বৌদ্ধমত ব্যক্তির জীবনের উপর কর্মফলের প্রভাব স্বীকার করে কিন্তু নিছক্‌ কর্মফলের হেতু ব্যক্তির চরিত্র একটি বিশেষ রূপ পায় এটি স্বীকার করে না। বহু কারণের সমন্বয়ে মানবচরিত্র গঠিত,—একটি দেহ-জাত কারণ, একটি বংশ-জাত কারণ, একটি সামাজিক কারণ ও একটি কর্ম-প্রসূত কারণ।

ব্যক্তির চরিত্রের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধ শাস্ত্র ক্ষান্ত দেয় নি. চরিত্র-হিসেবে ব্যক্তিকে ছয় শ্রেণীতে ভাগও করেছে—(এক) কামুক (দুই) ক্রোধপরায়ণ (তিন) অ-জ্ঞানী (চার) অবিশ্বাসী (পাঁচ) অল্পে-বিশ্বাসী (ছয়) জ্ঞানী।

যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সংযমী, বিগত-ক্রোধ ও সত্যনিষ্ঠ। জ্ঞানের ভিতরই সংযম, ক্রোধশূন্যতা ও নিষ্ঠা আছে বলেই পৃথক করে সংযমী, বিগতক্রোধ ও নিষ্ঠাবানের কথা বলার প্রয়োজন হয় নি।

এই ভাবে ভিপস্সনা ভাবনা-র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধক জ্ঞানের পয়ঁত্রিশটি নীতির চর্চা করবেন। এই পঁয়ত্রিশটি নীতিকে 'বোধিপক্ষিয় ধম্ম' অর্থাৎ বোধি-অনুকূল ধর্ম বলা হয়। এই নীতিতে সিদ্ধি লাভ করলে সাধকের মন সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, সাধক নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই নির্বাণ লাভ করতে গেলে যে দশটি শৃঙ্খলে (সন্নোজন-এ) প্রাণী শৃঙ্খলিত সেই শৃঙ্খলগুলি ছিন্ন করতে হবে। সেই দশটি হচ্ছে—(এক) আত্ম-মায়া (দুই) অবিশ্বাস (তিন) রীতি ও পদ্ধতিতে আসক্তি (চার) কাম (পাঁচ) দ্বেষ (ছয়) রূপ-জগৎ সম্বন্ধীয় বাসনা (সাত) অরূপজগৎসম্বন্ধীয় বাসনা (আট) অহংকার (নয়) উত্তেজনা ও (দশ) অবিদ্যা, অজ্ঞানতা।

যে সাধক আত্ম-মায়া, অবিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতিতে আসক্তি-মুক্ত হয়েছেন তিনি নির্বাণ-প্রাপ্তির প্রথম পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। তাঁকে 'সোতাপন্ন' বলা হয়, সোতাপন্ন-র মানে যিনি নির্বাণের স্রোতে নেমেছেন।

যে সাধক কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তাঁকে 'সকদাগামিন' বলা হয়। তিনি নির্বাণের দ্বিতীয় পৈঁঠায় পৌঁচেছেন। সেই সাধক মাত্র আর একবার এই পৃথিবীতে আসবেন।

যে সাধক আত্মমায়া, অবিশ্বাস, রীতি-পদ্ধতি, কাম ও দ্বেষ জয় করেছেন তিনি 'অনাগামিন', তিনি কাম-লোক থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি আর এই লোকে ফিরবেন না। শুদ্ধ-রূপ-লোকে তাঁর বাস হবে। এটি নির্বাণের তৃতীয় পৈঁঠা।

যিনি এই দশটি শৃঙ্খল ছিন্ন করেছেন তিনি অরহৎ, তিনি বুদ্ধ, তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। এইটি হচ্ছে নির্বাণলাভের শেষ পৈঁঠা।

এই নির্বাণ-পথ-যাত্রী সাধককে শাস্ত্রের উপর কিম্বা গুরুর উপরে নির্ভর করলে চল্‌বে না। এ পথে সাধককে নিজের পথের আলো হতে হবে নিজেকেই। কেন না তথাগতেরা হচ্ছেন

"তুম্হেহি কিচ্চমাতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্‌খন্তি জায়িনো মারবন্ধনা।" ধম্মপদ